গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

চৈত্রের গাজন উৎসবের শেষে, নতুন হর্ষে শুরু হয় বাঙালির নববর্ষের বরণোৎসব। এই নববর্ষ বাঙালির জীবন ও মননের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। হালখাতা আর মিষ্টি মুখে নতুন উদ্যমে লেগে পরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গত দু-বছরের অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থায় কোথায় যেন নববর্ষের সেই উদ্যমতায় পড়েছে ভাটা। তবে সব কিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে এই আশাই রাখছি সবাই...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১
এপ্রিল ২০২২

সংস্কৃতি সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী অপূর্ব চক্রবর্ত্তী, সুজন ভট্টাচার্য, সামিমা খাতুন, পিনাকী বিশ্বাস এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

'সংস্কৃতি' শব্দটির সাথে আমরা কম-বেশি সবাই খুব পরিচিত। এই 'সংস্কৃতি' শব্দটি গূঢ় অর্থবোধক। 'সংস্কৃতি'র অভিধানিক অর্থ হল চিত্তপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্টের উৎকর্ষ সাধন। এই শব্দটির ব্যবহারের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, প্রায় ১৯২২ সাল থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে এই্ 'সংস্কৃতি' শব্দটি নিজ গুণে স্থান লাভ করে নিয়েছে।

'সংস্কৃতি' হল এমন একটি শব্দ যার সাথে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি জড়িত রয়েছে। আমাদের চর্চার পীঠভূমি যেহেতু বাংলার সাহিত্য অঙ্গন, সেহেতু বাংলা সাহিত্যের সাথে সংস্কৃতির যোগসূত্র কেমন – এখানে তা আলোচনা করাই শ্রেয়।

সবচেয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক সাহিত্য কর্মে উঠে এসেছে সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব। প্রতিটি লেখনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে ভারতীয় তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐকান্তিক মেলবন্ধনের ভাবনা। সাহিত্য হল এমন একটি পবিত্র মাধ্যম যেখানে একটি জাতির জীবন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কিংবা আঞ্চলিক স্থান ও কালের সংস্কৃতিকে ভাষাশৈলীর বাঁধনে, নব নব আঙ্গিকে, বর্ণনার ক্ষুরধার কলমে উপস্থাপিত করা হয় পাঠক পাঠিকাদের অবগতি ও মনোরঞ্জনের জন্য। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: মে ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই এপ্রিল, ২০২২

অবৈধ

অপূর্ব চক্রবর্ত্তী

(১)

রক্তচোষা রক্তচোষা লতায় করিস কি?
হৃদপিণ্ডে আয়না আমার রক্ত রেখেছি।

কালনাগিনী লুকোস কেন ঝোপের তলে ছায়ায়?
বিষের থলি উজাড় করে মার না, ছোবল মাথায়।

শনির বাহন শনির বাহন, শকুন পাখি লো
তোকেই কেন দুষছে সবাই, ঘর কে ভাঙল?

ঘর-ভাঙানি কপালখানি তোর কপালে সিঁদুর
আমার হৃদয় কাটছে দাঁতে মান খোয়ানোর ইঁদুর।

কেউ দোষী নয় কেউ দোষী নয়, ভাগ্য কোথায় যাবি?
আমিই নিজে হাত পোড়ালাম, আমি তো সেই পাপী।

(২)

ধুমন্ত এই চায়ের কাপে ঠোঁটটা ছোঁয়াব
ঐখানেতে মরণ আছে আগুন পোহাবো।

রূঢ় বাস্তব

রাত পোহানোর আগেই খসা খোঁপার বাঁধনে
ফুল গুঁজে তুই চললি মেয়ে আপন আগুনে।

আগুন রে তোর তেমনি সখাদ মাঘের সকালে
তুষ পোড়ানোর ধোঁয়া আমার চোখটা ভেজালে।

ভেজা চোখেই পর্দা সরাই ফসল কাটা মাঠ
বাইরে থেকে ঢুকছে ঘরে আমার দুয়ার হাট। ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ষষ্ঠ পর্যায় (২)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

আজ ২৩শে এপ্রিল ২০১৭। সকাল সাতটা পনেরো মিনিটে কোকসার থেকে যাত্রা শুরু করলাম। সকালের ঠান্ডা হাওয়ায় হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে। গত দু'রাতের ক্লান্তিকর বিনিদ্র যাত্রা কোনো বাঁধাই সৃষ্টি করতে পারছে না। চলার গতি খুব ভালো। এসে পড়লাম কুন্তিপুর গ্রামে। মহাভারতের বনপর্বে আছে বনবাস কালে পাণ্ডব জননী কুন্তি বহুদিন এখানে তপস্যা করেছিলেন। শিব মন্দিরটি অবশ্য দেখতে পেলাম না। কোনো দোকান নেই তাই গাছের তলাতেই একটু বিশ্রাম নিলাম। আস্তে আস্তে রোদের তাপ বাড়ছে। এখন প্রায় এগারোটা বাজে। প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা চলে এসেছি।

আরও চার কিলোমিটার দূরে এলাম কুলহারা গ্রামে। এখানে হত্যাহরণ নদী নর্মদায় মিলিত হয়েছে। দুপুর ১টা। আমরা এলাম অম্বরী গ্রামে। এখানে নর্মদা তটে প্রসিদ্ধ সাধু দুর্গানন্দজীর সমাধিস্থল। আর হাঁটতে পারছি না। সূর্যের তাপ প্রবলভাবে আমাদের পর্যবেক্ষন করছে। নর্মদার পাড়েই দুর্গানন্দজীর আশ্রমে আসন পাতলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম। দেখা হলো মৌনী সাধু

রাম লক্ষ্মণ জী মহারাজের সাথে। উনি অবশ্য গত কয়েক দিন হল মৌনব্রত ভঙ্গ করেছেন। আমাদের নিয়ে গেলেন ওনার কুঠিয়াতে। দিব্যানন্দজী আশ্রমেই বিশ্রাম নিচ্ছেন।

অনেকটা দুর্গের মতো ওনার কুঠির। অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হলো। তারপর একই ভাবে নীচে নেমে যাওয়া। খুব ঠাণ্ডা একটি গুহা। ধুনি জ্বলছে। মহারাজ বললেন, গত আঠারো বছর ধরে উনি এই গুহা সামলাচ্ছেন এবং পরিক্রমা করতে করতে উনি যখন এখানে আসেন তখন দুর্গানন্দজী ওনাকে স্বপ্নে আদেশ দেন এই কুঠিরে থেকে ধুনিকে অখণ্ড রাখতে। কারণ, এই কুঠির এবং ধুনি এক অত্যন্ত শক্তিশালী সাধুর কুঠি।

রাম লক্ষ্মণজী বললেন, "আমি দুর্গানন্দজীকে প্রশ্ন করলাম, বাবা আমি কি তাহলে আর পরিক্রমা করবো না?"

দুর্গানন্দজী বলেছিলেন, "উপযুক্ত সময় এবং উপযুক্ত লোকের হাতে এই কুঠির এবং ধুনির ভার দিয়ে তুমি আবার বেড়োতে পারবে।" সেই থেকে তিনি এই কুঠির এবং ধুনি সামলে চলেছেন। মহারাজ কুঠিরের বাইরে এনে আমাদের দেখালেন লক্ষ্মীকুণ্ড এবং মাতা কুন্তীর একটি শিব মন্দির।

বিকাল চারটে। সূর্যদেব তখনো প্রবল ভাবে তাপ বর্ষণ করে চলেছেন। আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। রাস্তার কথা যতই কম বলা যায় ততই ভালো। তাই আমাদের চলার গতি অতি মন্থর থেকে মন্থরতর হয়ে যাচ্ছে। নর্মদার পাড় ধরেই হাঁটা। প্রথম থেকেই দেখে আসছি নর্মদার তীরে চাষ খুব

ভালো হয়। এখানেও তার ব্যাতিক্রম নয়। এদিকটায় অনেক আমগাছ এবং কুল গাছ রয়েছে। তলায় প্রচুর ফল পড়ে রয়েছে। কুড়াবার লোক নেই। এই গরমে আমডাল, আমের আচার,বা কুলের চাটনীর স্বাদ বাঙালী ছাড়া আর কে জানে। প্রচণ্ড জল পিপাসা পেয়েছে। কয়েকটা পাকা কুল তুলে মুখে দিলাম। খুব মিষ্টি। কিন্তু শরীর আর চলছে না।

মাঠের চাষীরা উৎসাহ দিয়ে বলছে, “মহারাজ আরো এক কিলোমিটার-এর মধ্যে ভালো আশ্রম পেয়ে যাবেন। এগিয়ে যান।” কিন্তু তার পরেও আরো কত কিলোমিটার যে হাঁটলাম তার হিসাব করিনি, করে লাভও নেই। কারণ রাতে থাকার একটা জায়গা দরকার তাই এগিয়ে যেতেই হবে।

হঠাৎ নর্মদার উপর একটি বাঁধানো স্নানের ঘাট চোখে পড়ল, তাহলে নিশ্চই আশে পাশে কোনো গ্রাম আছে। কাছে যেতেই দেখি এক সন্ন্যাসী স্নান করছেন। গ্রামটির নাম জিজ্ঞাসা করতে বললেন, “ঘোগরা।”

উনি বললেন, এই গ্রামেই আমার একটা আশ্রম আছে আপনারা এখানেই রাতে থাকুন। স্নান এবং আরতি করে মহারাজের সাথে বেশ কিছুটা চড়াই ভেঙে পাড়ে উঠে ওনার আশ্রমে এলাম। এখানে আরো দু-জন পরিক্রমাকারী আছে দেখলাম। রাতে প্রায় ১০টা রুটির সমান এক একটি রুটি আর ডাল দিয়ে উনি খেতে দিলেন। চার ভাগের এক ভাগ রুটি আর একটু ডালই আমার কাছে যথেষ্ট।

“নর্মদে হর”

...ক্রমশ ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ কাগের পাকদণ্ডী সিঁড়ি...

শিল্পীঃ সাত্যকি ব্যানার্জি

সবাই জানাবেন এই চিত্রগ্রাহকের ছবিটি কেমন লাগল...

চেনা পথের অচেনা বাঁকে

সামিমা খাতুন

যেমন বিজ্ঞাপনে বলে, "এই দোকানের সিল্ক ভালো, ওই দোকানের তাঁত, এসব এখন অতীত..." সেরকমই ভ্রমণপিপাসু বাঙালি এখন 'দী-পু-দা'-কে প্রাক্তন বানিয়ে সন্ধান করে 'offbeat' জায়গার। এরকম একটি জায়গা হল 'কাগে'।

বহু আগে ঠিক করে রাখা বেড়াতে যাওয়া ভেস্তে যাওয়ায় অক্সিজেনের খোঁজে হঠাৎ ঠিক হওয়া গন্তব্য হল কাগে, কালিম্পং জেলার ছোট্ট একটি জনবসতি।

আমরা সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে চা-জলখাবার খেয়ে রিজার্ভ গাড়ি করে পেডং পৌঁছাই। পথের সাথী ছিল সুন্দরী তিস্তা। পেডং B.D.O.-র পাশেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, সেখান থেকে হোম স্টে-র ঠিক করা গাড়িতে করে সোজা পৌঁছালাম গন্তব্যতে।

পেডং থেকে কাগের রাস্তা বেশ রোমাঞ্চকর ও চমকপদ। একদিকে খাড়া ঢাল, অনেক নীচে সরু ফিতের মতো পাহাড়ি নদী, আর অন্যদিকে পাহাড়ের গায়ে ধাপচাষ, যার বেশিরভাগই সরিষা বা রাই, পুরো ফুলে ভরা কোনো সিনেমার দৃশ্যপটের মতোই সুন্দর বা বলা ভালো ভয়ঙ্কর

সুন্দর। কিন্তু ঐ যে বলে না, জান্নাতের রাস্তা কঠিন তো হবেই। Honeycomb homestay-টি সম্পূর্ণ নির্জন, কিন্তু কাগের বাজার মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। আমরা পৌঁছেছিলাম দুপুর দুটো নাগাদ। হাত মুখ ধুয়ে লাঞ্চ করে নিজেদের মতো আড্ডা দিলাম।

হোম স্টে-টি দুটি ধাপ নিয়ে তৈরি। নীচের ধাপে ঘর, রান্নাঘর আর সবচেয়ে সুন্দর একটা বড় খাবার জায়গা, যেখানে বসে উপভোগ করা যায় পাহাড়ি প্রকৃতির সৌন্দর্য, আর আবহাওয়া ও ভাগ্য ভালো হলে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। উপরের ধাপে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, চাইলে ওখানে তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নীচের ধাপ থেকে উপরের ধাপে যাওয়ার জন্য দু'দিক দিয়েই রয়েছে বাঁধানো সিঁড়ি।

হোম স্টে-টি সবেমাত্র গত অক্টোবর (২০২১) থেকে যাত্রা শুরু করেছে। পরিবারের সকলেই ভীষণ আন্তরিক, ভাষাগত কিছু সমস্যা সত্ত্বেও যখন যা প্রয়োজন, সবই হাসিমুখে জোগান দিয়েছেন। পরিবারে কাকা, কাকিমা এবং তাঁদের চার ছেলে আছে। প্রত্যেক বার খেতে বসলেই, কোনো না কোনো ভাই Guitar বাজিয়ে, গান করে পরিবেশটা আরও মনোরম করে তুলেছে, যেটা সত্যিই উপরি পাওনা। হোম-স্টে নিয়ে ওনাদের প্রচুর পরিকল্পনা রয়েছে, সব বাস্তবায়িত হলে পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

সন্ধ্যায় যতদূর চোখ যায়, শুধুই পাহাড়ের কোলে আলোর

মালা, অসাধারণ! চুপচাপ সেদিকে তাকিয়ে বসে থাকলে সময়ের খেয়াল রাখা অসম্ভব। সন্ধ্যায় বারবিকিউ, বনফায়ার-এর ব্যবস্থা ট্যাব তাঁবুর ওখানের ফাঁকা জায়গায়। রাতের আহার করে ঘুমের দেশে।

পরদিন সকালে প্রথম সূর্যকিরণের সাথে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী মন ভরিয়ে দেয়। অনেকটা সময় ঐ সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। পাহাড়ের সঙ্গে 'maggi'-র অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মর্যাদা রেখে সকালে আমরা 'Maggi with Kanchenjungha' উপভোগ করেছি। তারপর পায়ে হেঁটে কাগে বাজার ও আশপাশটা ঘুরে দেখব। বাজারটি ছোট্ট, অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়ার মতো। পাহাড়ী পথের বাঁকে, ঐ শান্ত পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলাই স্বাভাবিক।

বিকালে প্রায় ৪-টে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের চড়াই পথ পেরিয়ে দেখতে গেলাম চার্চ (Vijaya Rani Girja, Maria Busty), ওখানের নিস্তব্ধ মনোহর পরিবেশ মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেয়। ওখানের এক sister-এর সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি পুরো বাগান ঘুরে দেখালেন এবং চার্চের ব্যাপারে অনেক কিছু বললেন। ওনাদের সারা পৃথিবী জুড়ে শাখা রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ওনাদের transfer হয়। চার্চের হস্টেলে বাচ্ছারা থেকে পড়াশোনা করে। চার্চের নিজের প্রাইমারী স্কুল আছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত,

তারপরের পড়াশোনার জন্য ১ কিমি দূরের হাই স্কুলে যেতে হয়। চার্চের নিজের বাগান আছে, যেখানে বিভিন্ন রং-বেরং-এর ফুল ছাড়াও ফল, সব্জি সব চাষ হয়। ওখানে হাঁস, মুরগী,গরু পালন করা হয়, মাছ চাষ হয়। চাল, আটা, তেল, নুন এরকম কয়েকটি জিনিস ছাড়া প্রায় কিছুই কিনতে হয় না, এক কথায় almost self-dependent একটা সংস্থা। একটি dispensary ও আছে চার্চে।

পরদিন আমরা ফেরার পথে ডেলো পার্ক ঘুরে কালিম্পং থেকে বাসে করে শিলিগুড়ি পৌঁছাই, ওখান থেকেই রাতের ট্রেন ছিল। ডেলোতে দেখা পেলাম আর এক পাহাড়ী সুন্দরী রডোডেনড্রনের, যার লাল ফুল ভরা গাছ মনে দোলা দেবেই। চোখের সামনে paragliding দেখতে পাওয়াটাও আমার জন্য বিশাল ব্যাপার। ভীতুর ডিম বলে দূর থেকে দেখেই ভীষণ খুশি। ■

সম্মান এবং সমর্থন

সুজন ভট্টাচার্য

করুণা নয়, তাদের প্রয়োজন সম্মান এবং সমর্থন...

আমরা আর কতদিন প্রগতিশীল সবকিছু থেকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (Intellectual Disability - ID) ব্যক্তিদের বাদ দেব? আমাদের কাছ থেকে তাদের যা দরকার তা হল তাদের অনন্য জীবনধারার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং শুধু টিকে থাকার জন্য নয়, এমন একটি বিশ্বে সমৃদ্ধ হওয়া যা সমতা বজায় রেখে সবাইকে নিজের মধ্যে ধারণ করে, অন্তর্ভুক্ত করে।

বর্তমানে, আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় ক্রীড়া অঙ্গন কর্মব্যস্ততায়, উৎসবে এবং উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। প্রথমে কিছু জনপ্রিয় ঘটনা সংক্ষেপে বলি...

ভারতের ২০ বছর বয়সের চাঞ্চল্যকর ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন ১৯ মার্চে বার্মিংহামে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে একটা অভিনব চমকের সাথে প্রবেশ করেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী সেন সাংঘাতিক স্নায়ুর জোর দেখিয়ে মালয়েশিয়ার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লি জি জিয়াকে হতবাক করে পঞ্চম ভারতীয়

(চতুর্থ পুরুষ) হিসেবে অল-ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। সেন ২১ বছরের মধ্যে অল ইংল্যান্ড ওপেন ২০২১ এর ফাইনালে পৌঁছে থাকা প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিও হয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, ২০ মার্চে একজন দেশবাসীকে বিশেষ গৌরবময় অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে দেখার ১৪০ কোটি ভারতীয়দের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তরুণ খেলোয়াড় সেন ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর ডেনমার্কের ব্যাডমিন্টন তারকা ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের কাছে হেরে যান।

এদিকে, কয়েক দশক ধরে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বাণিজ্যিকীকৃত খেলা ক্রিকেটের খবরে ভারতীয়দের উল্লাসের কোন কারণ নেই। বরং, এটি হৃদয় বিদারক। সমস্ত প্রতিশ্রুতি-প্রত্যাশা এবং তার পাশাপাশি লীগ ম্যাচগুলোতে ভাল প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ভারতীয় মহিলারা নিউজিল্যান্ডে সদ্য সমাপ্ত মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২২-এর সেমিফাইনালে নিজেদের জন্য জায়গা করতে পারলেন না।

ক্রিকেট সম্পর্কে আরও বলতে গেলে, বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং উত্তেজনাপূর্ণ টোয়েন্টি ২০ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের (আইপিএল) পঞ্চদশ মৌসুম বর্তমানে তার চরিত্রগত বর্ণময় আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের সাথে চলছে।

এবারে আসি ঘরোয়া ফুটবলের কথায়। হায়দ্রাবাদ এফসি ২০ মার্চে কেরালা ব্লাস্টার্সকে পেনাল্টিতে ৩-১ গোলে পরাজিত করে তাদের প্রথম ইন্ডিয়ান সুপার লীগ (ISL 2021-22) এর শিরোপা জিতেছে।

করোনা অতিমারীর তৃতীয় ঢেউ পশ্চিমবঙ্গকে আঁকড়ে ধরার কারণেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত আই-লীগের ২০২১-২২ সংস্করণটি ২৯ ডিসেম্বর বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হয়েছিল। এআইএফএফ এবছরেরই মার্চে লীগের পুনঃসূচনা করার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সেটা একেবারেই হয়নি। যেহেতু এ বিষয়টা নিয়ে এআইএফএফ রহস্যজনক নীরবতা বজায় রেখেছে, ঠিক কবে আই লিগ আবার শুরু হবে তা কেউই সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেনা।

চকচকে নয় কিন্তু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে পালটে দিতে পারে এমন খেলা...

বোধশক্তি প্রতিবন্ধী (Intellectual Disability – ID বা আইডি) থাকা ২৫ লক্ষের ও বেশি মানুষ এবং তাদের পরিবার নিয়ে গঠিত সম্প্রদায় করোনা অতিমারীর প্রাদুর্ভাবের পর থেকে আগের থেকেও বেশি খারাপ পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করছে।

যাই হোক, স্পেশাল অলিম্পিকের কর্মীরা এর মোড় ঘোরাতে বদ্ধপরিকর। স্পেশাল অলিম্পিক হল একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন যা ১৯৬৮ সালে খেলাধুলার

রূপান্তরকারী শক্তির মাধ্যমে ঐসকল ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি ভাল এবং আরও সমতা-সম্পন্ন বিশ্ব তৈরি করার জন্য শুরু হয়েছিল। এই ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই সচেতনতা তৈরি করে এই ব্যক্তিদের জন্য বাধা-নিষেধ দূর করতে পারে। আর এসব করা সম্ভব হয় বছরব্যাপী ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে।

এই ধরনের উদ্যোগ বোধশক্তি প্রতিবন্ধী থাকা এই ক্রীড়াবিদরা যা করতে পারেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তারা কী করতে পারে না তার প্রতি নয়। এটা তাদের শারীরিক এবং জ্ঞানীয় ফিটনেস বা যোগ্যতা বিকাশ করতে, নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে গর্ববোধ করতে এবং ক্ষমতায়নের অভিজ্ঞতা একসাথে ভাগ করে নিতে সহায়তা করে।

লড়াইটি একটি ন্যায্য, আরও অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের জন্য। এবং এটি শুরু হয় মানুষের সবচেয়ে মৌলিক অধিকার – স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা থেকে স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষভাবে বৈষম্য...

গোটা বিশ্বের বহু গবেষণার ফলাফল এটাই দেখায় যে আইডি-যুক্ত লোকেরা প্রায়শই অন্যদের তুলনায় নিম্নমানের স্বাস্থ্যসেবা পান – এমন নিম্নমানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতে তাঁদের

জীবনযাত্রার মান এবং মৃত্যুর হারের অনেক বেশি ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও।

এটা অপ্রীতিকর সত্য যে ঐসকল ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা অধিকার হয় একেবারেই নেই অথবা তারা যা যত্ন পান তা মোটেই যথেষ্ট নয়। এটা মূলত মানুষের অক্ষমতার প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাবের নামান্তর মাত্র। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে স্পেশাল অলিম্পিক ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ৩৫% এর চিকিৎসা না করা দাঁতের ক্ষয়ের লক্ষণ ও চিহ্ন সুস্পষ্ট। গত দুই বছরে পরিস্থিতির অনেকটাই অবনতি হয়েছে, কারণ গোটা বিশ্ব অতিমারীর আঘাত থেকে বেরিয়ে আসার লড়াইয়ে নিমজ্জিত।

আমাদের সমাজের এই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যাকে প্রায়শই ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়, তাদের জন্য এবারের লড়াইটা অনেক শক্ত!

সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার এক সম্মিলিত উদ্যোগ...

ভারত সরকারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবাকে সমর্থন করার জন্য কিছু কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মক্রম (RBSK) যার লক্ষ্য চারটি 'D's (defects, deficiencies, diseases and developmental delays, including disability) কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং হস্তক্ষেপ করা।

যাই হোক, সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং আইডি যুক্ত লোকেদের জন্য সমস্ত বাধা দূর করা অত্যাবশ্যক। এতে শুধু সরকার নয়, প্রত্যেক নাগরিকেরই দায়িত্ব আছে – এবং একটা ভূমিকা রয়েছে, কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু পরিবর্তন আনার ক্ষমতা আছে।

স্বাধীনতার ৭৫ তম বছরে আমাদের সবার এটা বোঝা দরকার যে নাগরিকবৃন্দের প্রতিটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত না করতে পারলে অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের দিকে আমাদের অগ্রযাত্রা অসম্পূর্ণ। স্পেশাল অলিম্পিক ভারত ২০২২ এর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে (৭ই এপ্রিল) ভারতের ১২০ টি শহরে আইডি যুক্ত ৭৫,০০০ ব্যক্তিদেরকে স্ক্রিনিং করার জন্য একটা জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি "ন্যাশনাল হেলথ ফেস্ট ফর দিব্যজ্ঞান – উই কেয়ার" চালু করা হয়েছে।

এই উদ্যোগটা সারা দেশে সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য ও ফিটনেস কর্মসূচির সৌজন্যে এবং এর লক্ষ্য একদিনে সারা দেশে রেকর্ড সংখ্যক লোকের পরিচয়পত্র স্ক্রিনিং করা। আইডি থাকা ক্রীড়াবিদদের উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৭৫,০০০ চিকিৎসা ও ক্রীড়া পেশাদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অধিকন্তু, একটা সম্প্রদায়-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে ফিটনেস এবং খেলাধুলার বিকাশের জন্য ৭৫০টি স্পেশাল অলিম্পিক ভারত কেন্দ্রকে সক্রিয় করা হবে।

"স্পেশাল অলিম্পিক ভারত ২০২২" এ অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা...

(সৌজন্য: www.specialolympicsbharat.org)

এটা বোধশক্তি অক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণার পরিবর্তনের দিকে এক বৃহৎ পদক্ষেপ। একটা ঐক্যবদ্ধ দেশের সম্মিলিত জনগণ অবশেষে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে যারা প্রতিটি প্রগতিশীল প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ থেকে এতাবধি বাদ পড়ে এসেছে।

বোধশক্তি প্রতিবন্ধী থাকা ব্যক্তিদের আমাদের করুণা বা সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। তাদের যা প্রয়োজন তা হল তাদের ক্ষমতার স্বীকৃতি, তাদের অনন্য জীবনধারার প্রতি সম্মান এবং শুধু বেঁচে থাকার নয় বরং সর্বসমৃদ্ধ এমন একটা বিশ্বে উন্নতি সাধনের ন্যায্য সুযোগ। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ শিশু...

শিল্পীঃ রুদ্র দাস ✧ **বয়সঃ ১১** বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

লাইফাই (LiFi) কি ওয়াইফাই (WiFi) কে টেক্কা দিতে চলেছে?

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

এলইডি বাতির (LED lamp) উদ্ভাবন মানব সভ্যতার জন্য সত্যিই একটি বড় আশীর্বাদ এই কারণে যে এগুলো কেবল আলোই দেয় না, বরং এরা অন্যান্য ডেটা সংগ্রহ (Data Collection) এবং যোগাযোগ (Communication) সম্পর্কিত কাজগুলি সম্পাদন করতেও সমানভাবে সক্ষম। আজকের আধুনিক জীবনে, যখন ইন্টারনেট অফ থিংস (Internet of Things – IoT) আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তখন ওয়াইফাই সিস্টেমের মাধ্যমে ডেটা শেয়ার না করে কাজকর্ম করা প্রায় অসম্ভব। তবে, স্পেকট্রাম ক্রাঞ্চের (Spectrum crunch) সমস্যাটিও খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে – এবং শীঘ্রই এটি একটি অত্যন্ত জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

এমতাবস্থায় বড় আশার আলো দেখাতে শুরু করেছে লাইফাই প্রযুক্তি (LiFi technology)। রেডিও সংকেতের (Signal) বিকল্প হিসেবে এটি একটি অদৃশ্যমান আলোক (Invisible light) দ্বারা সম্পাদিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এটি ১০০ Gbps (Gigabyte per second) এর বেশি গতিতে

ডেটা (Data) প্রেরণ করতে পারে। কেনেথ রিসার্চের অতি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, "(ডেটা পরিচালনের ক্ষেত্রে) লাইফাই অনেক বেশি নিরাপদ উপায়ে উচ্চ-গতি প্রদান করে, যা এমনকি সর্বাধুনিক ওয়াইফাইও দিয়ে উঠতে পারে না। লাইফাই ওয়াইফাইয়ের চেয়ে ১০০ গুণ দ্রুত ডেটা ট্রান্সমিশনে সক্ষম, যা এর অধিক পারদর্শিতার পরিচায়ক।"

লাইফাই প্রযুক্তিতে, এলইডি আলোর বাল্বগুলিকে (LED bulbs), মানুষের চোখে ধরা পড়েনা এমন, আলোর তরঙ্গ (Light wave) নির্গত (Emit) করার জন্য তৈরি করা হয়। এই অদৃশ্যমান নির্গত তরঙ্গের মাধ্যমেই, ডেটা রিসিভারগুলিতে (Data receivers) পৌঁছায় এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে বা ঘোরাফেরা করতে পারে। তারপরে, রিসিভারগুলি তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করে, এবং সেইমতো কাজ করে। এই কারণেই, যখন প্রথাগত ইন্টারনেট (Traditional Internet) যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা উৎপন্ন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিগুলি (Radio frequencies) বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় (Health related) উদ্বেগ সৃষ্টি করে, তখন লাইফাই দ্বারা সঞ্চালিত ডেটা (Data communication) একটি খুব স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি।

সাধারণ নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও, লাইফাই অনেক ভালো। পেট্রোল পাম্প (Petrol pump) এবং পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের (Petrochemical plant) ভিতরে, যেখানে ওয়াইফাই বা মোবাইল ফোনের (Mobile phones)

ব্যবহার খুবই বিপদজনক, সেখানে লাইফাই হোল একটি নিরাপদ তথ্য সঞ্চালনের উপায় (Data communication solution)। তাই আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই, লাইফাই প্রায় সম্পূর্ণরূপে ওয়াইফাই সিস্টেমকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। তবে আজকের পরিস্থিতিতে যা দেখা যাচ্ছে, বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ওয়াইফাই-কেও ব্যবহার করতেই হবে। তাই এই সময় এটাই বলা ভাল যে – লাইফাই সিস্টেম অতি শীঘ্রই ওয়াইফাই সিস্টেমের পরিপূরক হতে চলেছে। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।
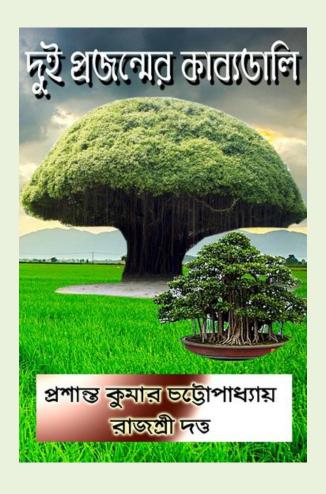
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

নূর

(অন্তিম পর্ব)

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

দীপু এখন একটা বড় কোম্পানির এক সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। গত দশ বছরে সে তিনবার প্রমোশন পেয়েছে। সারা বছর সে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ট্যুর করে বেড়ায়। কোন দিকে তার তাকানোর সময় নেই। এক বিশাল ফ্ল্যাট কিনে মা বাবাকে নিয়ে থাকে সে। সংসারের কাজের জন্য গোটা চারেক কাজের লোক। মা বাবার বিন্দু মাত্র অসুবিধা হতে দেয় না। তাদের জন্য একটা আলাদা গাড়ি সব সময়ে বাড়িতে রয়েছে। এত বিলাসিতা স্বত্বেও দীপুর মায়ের মনে সুখ নেই। তিনি সব সময় ছেলের বৌয়ের মুখ দেখতে চান। আত্মীয় স্বজনরা দীপুর জন্য নিজেদের পরিচিত মেয়েদের কথা মাঝে মধ্যেই তার মায়ের কাছে বলেন। মায়ের সাহস হয় না সেই সব কথা দীপুর কানে তোলেন।

মায়ের মনে পড়ে ওর অফিসের একটি মেয়ে হুবহু নূরের মতো দেখতে, প্রথমবার তো তাকে দেখেই মা নূর বলে ভুল করেছিলেন। দীপুকে সে ভালোবেসে ফেলেছিল। এক সময় প্রপোজও করেছিল। দীপু কিছুদিন পরে তাকে

ট্র্যান্সফার করে দেয়। মেয়েটি মনের ব্যথায় চাকরি ছেড়ে দীপুর বাড়িতে এসে ওর মাকে সব খুলে বলেছিল। মা সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বাড়ি ফেরৎ পাঠান। যাওয়ার সময় মেয়েটি বলে যায় আমি ওর থেকেও বড় হব আর ওর জন্য অপেক্ষায় থাকবো। মা এসব কথা দীপুর কাছে গোপন করে যান। মা বাবা কখনো কথা প্রসঙ্গে পুরানো কথা টেনে আনলেই সে বোলে ওঠে, "মানুষের এগোনোর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে পিছনে ফিরে চায়। আমার সামনের রাস্তা খোলা। আমার সামনে পুরানো গল্প টেনে আমায় বিরক্ত করো না।"

মা-বাবা চুপ করে যান। দীপুর মনে এক বিশাল অভিমান রয়েছে, সে সব সময় ভাবে নূর তো ঢাকাতেই থাকে, ইচ্ছে করলেই তো তার সাথে দেখা করতে পারে। একটা ছেলে হয়ে ওর শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া শোভন নয়। কিন্তু সে তো যোগাযোগ করতে পারত! এই অভিমান সে প্রকাশ করে না। অফিসের মেয়েরা আড়ালে আবডালে তার চেহারা তার গাম্ভীর্য নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু কখনোই তার সাথে কথা বলতে সাহস পায় না। সব মেয়েরাই তাকে নিয়ে মনে মনে স্বপ্ন গড়ে চলে। দু'বছর পর পর কোম্পানির এ্যানুয়াল প্রোগ্রামে সেও যায়, অফিসের সব ছেলে কলিগদের সাথে কথা বলে, কিন্তু কোন মেয়ে কলিগের দিকে তার নজর নেই। তার গাম্ভীর্যের সামনে কেউই ঘেঁষতে পারে না।

নঈম আর তার স্ত্রীর আদর যত্নে নূর তার হারানো রূপ

যেমন ফিরে পেয়েছে তেমনি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে কিসব ট্রেনিং নিয়ে সেও একটা মোটা টাকার চাকরি পেয়েছে। এয়ারপোর্টের কাছে মাঝারি ধরনের সুন্দর একটা ফ্ল্যাট কিনে এখন সে ঢাকায় থাকে। নঈমই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। নঈমের ব্যাবসা এখন আরো বড় হয়েছে। সেই কচুরীর দোকান থেকে মিষ্টির দোকান, ড্রাই ফ্রুট, কাপড়, ঘড়ি, বাস লরির ব্যাবসা কি নেই। তাদের একটি সুন্দর মেয়ে আছে। সে এবার ক্লাস নাইনে উঠেছে। নঈম ও তার স্ত্রীর ধারণা তাদের এত বড় ব্যাবসা নূর এখানে থাকার জন্যই হয়েছে। ব্যাবসার কারণে তারা হুটহাট করে ঢাকায় নূরের কাছে যেতে পারে না তবে ফোনে সব সময়ই খোঁজ খবর রাখে।

ছুটির দিন, নূর নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে সপ্তাহের বাজার করে ফিরছে, এক মদ্যপ অটো চালক উল্টো দিক থেকে এসে রাস্তার ধারে ডিভাইডারে মেরে তার গাড়ির সামনে উল্টে গেল। নূর জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। সি এন জি তে আগুন লেগে দাউদাউ করে অটো জ্বলে ওঠে। পথচারীরা দৌড়ে এসে অটো চালককে বের করে। নূর অটো চালককে দেখে চমকে ওঠে, এ মুখ তার চেনা। একদিন এই লোকটিই অত্যাচার করে তাকে তালাক দিয়েছিল। ঘৃনায় মনটা ভরে ওঠে। ভাবলো পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। মানবিকতার কারণে সে পারলো না, গাড়িতে করে কাছের সরকারি

হাসপাতালে নিয়ে গেল। শরীরের অনেকটাই ঝলসে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে নূর তার ফ্লাটে ফিরে যায়। ভাবতে থাকে নিয়তির কি পরিহাস এই অটো চালক একদিন তার অত্যাচারিত স্বামী ছিল। মানুষের এত অধঃপতন! চাকরি পেয়ে সে ছেলেকে নিজের কাছে আনতে চেয়েছিল, ছেলেকে আসতে দেয়নি পাষন্ডটা। প্রচন্ড দুর্ব্যবহার করেছিল তার ফেলে আসা শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। ছেলেও নূরের মন থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছে।

দীপুর পরিবর্তন তার মাকে বড়ই চিন্তিত করে তুলেছে। মা বুঝতে চেষ্টা করেন ছেলে কি কাউকে ভালোবাসে? সেকি কোন মেয়ের কাছ থেকে মনে কোন আঘাত পেয়েছে? নানা চিন্তায় মায়ের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। দীপু আজ অনেক তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরেছে, তাকে রাতেই বের হতে হবে। মাকে ডেকে বলে, “আমি আজ দুবাই যাচ্ছি দুদিন পরে ফিরব।” এ ধরনের কথা শুনতে শুনতে মা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে সে এয়ারপোর্ট রওনা হয়ে যায়। প্লেনের আই সিটে বসে চোখ বুজে থাকে। সুন্দরী এয়ারহোস্টেসরা তাদের ডিউটি করে চলেছে। দীপু কোনদিনই তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আজও তাদের দিকে কোন নজর নেই। আজ তার খুবই ঘুম পাচ্ছে। সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে একজন এয়ারহোস্টেস এসে বলে, “স্যার, কফি

ওর টি?” চোখ না খুলে বলে “নো থ্যাংস।” কিছুক্ষণ পরে এলো ব্রেকফাস্ট। দীপু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এয়ারহোস্টেস তাকে বিরক্ত করল না।

ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠে ওয়াশ রুম থেকে ফ্রেশ হয়ে নিজের সিটে এসে বসল দীপু। একজন এয়ারহোস্টেস তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, “সার আপনার ব্রেকফাস্ট কি সার্ভ করবো?” চারিদিকে তাকিয়ে দীপু বুঝে গেল ব্রেকফাস্ট অনেক আগে সার্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু এ রকম ভাবে তো কোনদিন কোন ফ্লাইটে এয়ারহোস্টেসরা এসে বলে না। ও “নো থ্যাংস” বলে নিজের ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল।

কিন্তু কে যেন কানে মুখ রেখে বলল, “খেয়ে নাও, নয়তো শরীর খারাপ করবে, লজ্জার কিছু নেই। একদম পাগলামি করবে না।” ঘাড় ঘুরিয়ে সে চমকে উঠল। তার গলা বুজে আসছে, কিছু বলতে গিয়েছিল এয়ার হোস্টেস ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে তাকে চুপ থাকতে বলে তার হাত থেকে ল্যাপটপটা নিয়ে ওভার হেড বিনে তুলে সামনে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়। চোখের ইশারায় বলে যায় তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে। দীপু কি করবে বুঝতে পারছে না। পেটে ক্ষিদেও রয়েছে, লজ্জা না করে শান্ত ছেলের মতো খেয়ে নেয়। তার শরীরে বিদ্যুতের ঝলক বয়ে চলেছে। খাওয়া হয়ে গেলে, সে স্যুইচ টিপে এয়ার

হোস্টেসের দৃষ্টি আকর্ষন করে।

একজন এয়ারহোস্টেস এগিয়ে আসে। দীপু তাকে বলে আমাকে যে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে তাকে একবার আমার কাছে পাঠাও। এয়ারহোস্টেস তার হাতে একটা ছোট্ট কাগজ ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। তাতে শুধু একটা মোবাইল নম্বর লেখা।

দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে বেরিয়েই দীপু দেখে কোম্পানীর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। গাড়িতে উঠে ফোন করবে বলে মোবাইল বের করে, আর তখনই মোবাইল বেজে ওঠে, অফিসের বস ফোন করেছেন। দীপু তার ল্যাপটপ খুলে সব আপডেট দিতে থাকে। কোম্পানীর গেষ্ট হাউসে ঢুকে ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে পরে অফিসে। সারাদিনের কাজের চাপে ভুলে যায় মোবাইল নম্বরটার কথা। রাত্রে ফিরে ফ্রেস হয়ে খেতে বসে মনে পড়ে যায় মোবাইল নম্বরটার কথা। ফোন করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে নম্বরটা বের করে মোবাইলে কল করে।

অপরপ্রান্ত থেকে এক নারী কন্ঠ ভেসে আসে, “কেমন আছো? রাত্রের খাবার খেয়েছো? আগামীকাল বিকালে একবার দেখা করতে পারবে? তোমাকে এস এম এস করে দিচ্ছি ঠিকানাটা।” দীপু রীতিমতো থতমত খেয়ে যায়। কোনরকমে আমতা আমতা করে বলে ঠিক আছে। ফোনের লাইন কেটে যায়। রাত্রে ঠিক মতো ঘুম হয় না দীপুর।

মাথায় নানা কুচিন্তা এসে জড়ো হতে থাকে। কে এই নারী? কি তার অভিসন্ধি? অথচ এ মুখ তার খুব চেনা মনে হচ্ছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দীপঙ্কর দেখে একটা এস এম এস এসেছে। সেভেন স্যান্ডস রেস্টুরেন্টের ঠিকানা – দুবাইয়ের দামী রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্য একটা। নীচে লেখা সন্ধ্যা ছ'টা। এ রেস্টুরেন্ট তার চেনা। এই ভদ্র মহিলাই কি সেই মহিলা? কেনই বা এত দামী এক রেস্টুরেন্টে তাকে আমন্ত্রণ জানালো? এস এম এসের উত্তরে সে জানিয়ে দিল বিকালে মিটিং আছে ছ'টায় পৌঁছাতে পারবে না।

উল্টো দিক থেকে এস এম এসে উত্তর এলো, "আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবো না, আজ রাতের ফ্লাইটেই ঢাকায় ফিরে যাবো। সারাদিন অফিসের কাজে মনটা কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। অফিসের পর রেস্টুরেন্টে পৌঁছাতে সন্ধ্যা পৌনে সাতটা বেজে গেল। ক্যাশ কাউন্টারের সামনে এক অপরূপ সুন্দরীকে দেখে তার দৃষ্টি থমকে গেল। ভাবতে থাকে একেই কি সে এয়ারক্র্যাফটে দেখেছিল? দূর থেকে মনে হয় এ যেন তার অফিসের সেই পুরানো সহকর্মী যে একদিন প্রপোজ করেছিল। সেদিন দীপু কি অন্যায়টাই না করেছিল। প্রথম দিন অফিসে ঢুকে মেয়েটিকে দেখেই চমকে উঠেছিল। মানুষের সাথে মানুষের এত মিল থাকতে পারে! এতো হুবহু নূর। তফাৎ শুধুই তার উগ্র বেশ ভূষায় আর রূপচর্চায়। প্রথম দিকে ভুল করে দু' একবার 'নূর' বলে

ডেকেও ফেলেছিল। মেয়েটি জানতে চেয়েছিল নূর নামে তার জীবনে কেউ আছে কিনা? দীপু উত্তরও যেমন দেয়নি তেমনি কথা বারবার সুযোগও দেয়নি। আর একদিন মেয়েটি যখন প্রপোজ করল তখন কিছু না ভেবেই সে তার ট্রান্সফারের বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। তবে কি তার মনেও নূরকে নিয়ে কোন স্বপ্ন ছিল? মেয়েটির তো কোন দোষ ছিল না, শুধু নূরের মতো দেখতে, এটাই কি তার অপরাধ? আর মনে করতে পারে না। বহুদিন সে কোন নারীর দিকে তাকায়নি এভাবে। এ মুখ যে তার ভীষণ চেনা।

সে এগিয়ে যায় কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলল, "খুব দেরি হয়ে গেছে। আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। রাতের ফ্লাইটেই ঢাকায় ফিরে যাব। দীপুর গলা দিয়ে আজ যেন কোন কথা বের হতে চাইছে না। এভাবে সে দেখা পাবে ভাবতেই পারেনি।

মেয়েটি বলল, "তুমি ঠিক সেই একই আছ। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে তা চেহারায় আর গাম্ভীর্যে। বিয়ে করেছ?"

দীপু ঘাড় নেড়ে বলে 'না।' সামনে যাকে দেখছে শুধু মুখে নয় তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন রূপ ঝরে পড়ছে। সে এক দৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দীপু তাকে বলে সেও আগামীকাল ঢাকায় ফিরবে। অনেক কথাই বলার ছিল কিন্তু অবাধ্য সময় দুজনকে ক্ষনিকের জন্য দেখা করিয়ে আলাদা করে দেয়।

মেয়েটির চোখে জল, তাকে যে যেতেই হবে, খুব দেরি

হয়ে গেছে। একটা ক্যাব ডেকে মেয়েটি উঠে পড়ে। ক্যাবে বসে দীপুর দিকে একটা বন্ধ করা খাম এগিয়ে দেয়। ও হাত বাড়িয়ে খামটা নেয় খামের ওপর খুব সুন্দর হাল্কা গোলাপী রংয়ের একটা গোলাপ সেলো টেপ দিয়ে আটকানো। মেয়েটি মিষ্টি হাসি দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নেয়। কত কিছু বলতে চাইছে সে সব যেন এক সাথে ঠোঁটের ওপর আছড়ে পরে জট বেঁধে গেছে। দীপুও আজ ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। খামটা খুলতে গিয়ে তার পুরানো কথা মনে পড়ে যায়। এক যুগ আগে পদ্মার চরে এমনই এক খাম খুলে সে যে আঘাত পেয়েছিল আজও তার ক্ষত সে বহন করে চলেছে। অফিসের ড্রাইভার দীপুকে গেস্ট হাউসে ছেড়ে দেয়। রাতের খাবার খেয়ে সে শুয়ে পড়ে।

দীপু আজ নূরের কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে স্বপ্নে দেখে, সেই কলেজ জীবনের মতো নূর আর সে পদ্মার চরে বসে গল্প করছে। নূর তার নূতন রান্না করা খাবার নিয়ে এসেছে, সে সবটা খেয়ে নিয়েছে। নূর এঁটো বাসনটা পদ্মার জলে ধুতে নিয়ে গেছে। হঠাৎ পাড় ভেঙ্গে পড়ার শব্দ! পদ্মার চর ভেঙ্গে নূর জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছে। সে 'নূর নূর' করে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে জলে ঝাঁপ দিতে যায়, পাড়ে বসা মাঝিরা তাকে ধরে ফেলে। সে আপ্রাণ চেষ্টা

করে নিজেকে ছাড়াবার, পেরে ওঠে না। ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠছে। দীপু ভাবে একি স্বপ্ন দেখলো সে! ফ্রেস হয়ে নিয়ে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে বেরিয়ে পড়ে সে।

আজ ফেরার টিকিট করা। সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। বিকালে একটা মিটিংও আছে। মিটিং শেষ হতে একটু সময় নেয়। অফিস থেকে সোজা এয়ারপোর্ট চলে যায় দীপু।। এয়ারপোর্টেই রাতের খাবার খেয়ে একটু জিরিয়ে নেয়। যথা সময়ে চেক ইন করে এয়ারক্রাফটে নিজের আসনে বসে। আজ আর তার ঘুম আসছে না। সামনে রাখা খবরের কাগজটা টেনে নেয়। প্রথম পাতায় চোখ পড়তেই তার সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়।

গতকাল রাত্রের ঢাকা দুবাই প্লেন ক্রাশ করেছে। তাড়াতাড়ি ওভার হেড বিন থেকে হাত ব্যাগটা বার করে সেই খামটা খোলে। একটা পোট্রেট, যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

ছবিটার পেছনে লেখা, "দীপু, এবার কি আমরা একসাথে এক নূতন করে জীবন গড়তে পারি না?" সঙ্গে একটা মোবাইল নম্বর দিয়ে পাশে লেখা ঢাকায় ফিরেই ফোন করবে।

ইতি - তোমার নূর - শুধুই তোমার।

নূরের এত পরিবর্তন! সে নূরকে সত্যিই চিনতে পারেনি। ভেবেছিল অফিসের সেই কলিগটি। যাকে বিনা অপরাধে সে

ট্র্যান্সফার করেছিল, মেয়েটা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। খবরের কাগজে খুঁজতে থাকে নূরের নাম আছে কিনা! পাঁচজন ক্রু ও হোস্টেস কেউই বেঁচে নেই, সেই লিস্টে প্রথম নামই নূরের। বুকের মধ্য এক অসহ্য যন্ত্রনা অনুভব করে।

সন্ধ্যায় বাড়িতে ঢুকে কলিং বেল টেপে সে। মা দরজা খুলে কেমন যেন শিউরে ওঠেন। ছেলের মুখের একি চেহারা। মনে হচ্ছে সারা শরীরের ওপর দিয়ে এক ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গেছে। মা ছেলের কাছে জানতে চান কি হয়েছে? কোন উত্তর না দিয়ে দীপু নিজের ঘরে চলে যায়। মা দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসেন।

রাতে মা দীপুকে খেতে ডাকেন। উত্তর না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন লাইট নেবানো। টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি। দীপু উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে। মা আস্তে করে ছেলের মাথায় হাত রাখেন। এই প্রথম দীপু কান্নায় ভেঙ্গে পরে, মাকে জড়িয়ে ধরে বলে নূর নেই। মা কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারেন না। তার গাল বেয়ে নীরবে গড়িয়ে পড়তে থাকে দু'চোখের জল। কিছুক্ষণ ছেলের মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মা।

মোমবাতির পেছনে হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে নূরের ছবিটা, সামনে তার পড়ে আছে একটা হাল্কা গোলাপী রংয়ের গোলাপ। ■
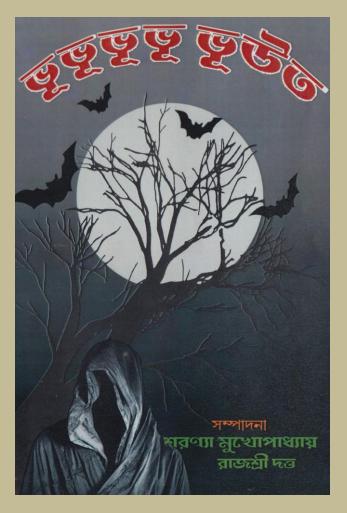
বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিনাশ

(প্রথম পর্ব)

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

মাঝরাতে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে অনির্বানের আধো আধো ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে সে দেখে একটা অখ্যাত স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রেনের ভিতরের ও বাইরের টিমটিমে আলোয় সে দেখতে পেল প্লাটফর্মে দু-একটা ভবঘুরে ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। প্লাটফর্মে দু-একটি দোকান আছে বটে, কিন্তু বন্ধ। তার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। জলের বোতলে এক ঢোকও জল নেই। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। না, জলের কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে ভেবে ট্রেন থেকে অনির্বান নেমে পড়ল। কিন্তু কোথাও পানীয় জল নেই। প্লাটফর্ম সংলগ্ন রেলের রিজার্ভারে পানীয় জল লেখা দেখে উৎসাহিত হয়ে কল খুলে সে দেখে এক ফোঁটাও জল পড়ছে না, এমনকি নীচের সিমেন্টের বাঁধানো জায়গাটাও শুকনো খটখটে। চৈত্র মাসের প্রচন্ড গরমে জামা ভিজে যাচ্ছে। নিরাশ হয়ে ট্রেনে উঠতে উঠতে সে ভাবল, পরের কোনো স্টেশনে নিশ্চয়ই জল পাওয়া যাবে। সিগন্যালও হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে ট্রেনে উঠে, সে নিজের

জায়গায় এসে বসতেই উল্টোদিকে বসা এক তরুণী বলে উঠলেন, "জল পাননি বুঝি, এই নিন আমার কাছে জল আছে," বলেই জলের বোতলটা সে বাড়িয়ে দিল।

অনির্বান খানিকটা অবাক হল বটে, কিন্তু দারুন তেষ্টায় তার গলা-জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই ফট করে জলের বোতলটা নিয়ে ঢকঢক করে এক নিমিষে অনেকটা জল খেয়ে, সে বোতলটা প্রায় শেষ করে তরুণীকে থাঙ্কস জানাল।

অনির্বান বরাবরই এ-সি- ক্লাসে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে কোম্পানি বলল তাকে কালকেই ভাগলপুর যেতে হবে। এ-সি- ক্লাসের কোন টিকিট নেই আর ফ্লাইট করে ডাইরেক্ট যাওয়ার কোন টিকিট পাওয়া গেল না, তাই অগত্যা স্লীপারের রিজার্ভেশন করে সে কোচে উঠে বসেছে।

ট্রেনে ঠাসাঠাসি ভিড়, ভাগ্য ভালো লোয়ার বার্থ পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু লোক উঠে সিটে বসে পড়েছে। বিহার বেল্টে এইরকমই হয়। কিছু বললেই বলে "কেয়া করেগা বাবু, গরীব আদমি, আনে বালা স্টিশন মে উতর জায়েগা..." টি টিও কিছু বলেনা ... ভয় এই যে টি-টি- কেও ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। অনির্বান ভাগলপুরে তার মাসির বাড়িতে থাকবে। ভাগলপুর জায়গাটা অনির্বানের নেহাৎ খারাপ লাগে না। সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কিউল নদীর উপর নতুন রেলসেতু এবং ইলেকট্রিক ইন্টার লকিংয়ের ব্যবস্থা

হবে। কোম্পানি তার বরাত পেয়েছে। তাই অনির্বান ব্রিজের নকশাপত্র নিয়ে জায়গাটা ইন্সপেকশনে যাচ্ছে, সরকার বাহাদুরের লোকজনও থাকবেন, প্রাথমিক কাজও শুরু হয়ে যাবে, অন্তত মাটি খোঁড়ার কাজটা শুরু হবে ।

ট্রেনে নিজের সিটে বসে উল্টোদিকের সেই তরুণীর দিকে তাকাতেই, সে দেখতে পেল তার চোখ দুটি মুদিত, কিছু কুঞ্চিত কুন্তল কপালের পাশ দিয়ে মুখমন্ডলে ঝুলছে, বাইরের হাওয়ায় সেগুলি বার বার আন্দোলিত হচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই তরুণী তার বাঁ হাত দিয়ে বার বার চুল ঠিক করে নিচ্ছে, কিন্তু ফুরফুরে হাওয়ায় তা ব্যর্থ হচ্ছে, মেয়েটির চোখদুটি যে টানা টানা, চোখ বুজে থাকলেও তা বোঝা যাচ্ছে, ভুরু দুটি ভারী সুন্দর, টিকাল নাক, সরু চঞ্চু, গায়ের রং ফর্সা, ক্ষীণ তটি, এক কথায় সুশ্রী বলা যেতে পারে। গাড়ি ঔরাঙ্গাবাদ স্টেশনে এসে থামল। বেশ বড় স্টেশন, পাশে বসা দু-তিনটি লোক বোচকা-বুচকি নিয়ে নেমে গেল। এবার হয়তো একটু শোওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে জল কিনতে হবে। স্টেশনে নামতেই, সে মিনারেল ওয়াটার পেয়ে গেল। দু’ বোতল জল কিনে নিজের জায়গায় ফিরে এসে, সে দেখল উটকো কোন লোক এসে বসেনি। উল্টোদিকটাও খালি হয়ে যাওয়াতে ভদ্রমহিলা টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছেন। অনির্বান সবে গুছিয়ে শুতে যাবে, তখনই সেই তরুণী বলে উঠলেন, “জল কি পেলেন?”

"হুঁ পেয়েছি।"

"কতদূর?"

"ভাগলপুর।"

"আমিও, একটু স্টেশন এলে বলে দেবেন, আমার আবার ট্রেনে চট করে ঘুম ভাঙ্গে না।"

অনির্বান বলল, "ঠিক আছে ডেকে দেব।"

তরুণী গায়ের চাদরটি টেনে উল্টোদিকে ঘুরে গেল। অনির্বানের কিছুতেই আর ঘুম এল না। ট্রেনে চাপলে অনেকের ঘুম আসে না, প্রচন্ড দুলুনিতে বা কোন ব্রিজের উপর দিয়ে যাবার সময় ঘটাং ঘটাং আওয়াজে মনে হয় এই বুঝি ট্রেনটা উল্টে গেল বা নদীতে পড়ে গেল। অনির্বানের সেই একই অবস্থা। ব্যাগের মধ্যে ঘুমের ঔষুধ আছে, সেটা খেলে গভীর ঘুমে হয়তো ভাগলপুর পেরিয়ে যেতে পারে। তাই বাকি রাতটা অনির্বানের আর ঘুম হল না।

ক্রমে ক্রমে বাঁকা, বেগুসরাই স্টেশন পার হয়ে গেল, এরপরেই ভাগলপুর, নিজের ব্যাগেজ ঠিক করে অনির্বান উল্টোদিকের ম্যাডামকে একটু জোরের সঙ্গে বলে উঠল, "এর পরের স্টেশন কিন্তু ভাগলপুর।" ধরফর করে উঠে পড়ে সেই সুন্দরী অনির্বানকে থাঙ্কস জানিয়ে তাড়াতাড়ি রেডি হতে লাগল। ভাগলপুর স্টেশনে ট্রেন থামতেই তারা দুজনে নেমে পড়ল। ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

বাস্তবিক

স্টেশনের বাইরে এসে জানা গেল এইমাত্র একটা বাস ছেড়ে বেড়িয়ে গেছে। প্রপার টাউনে যাবার বাস আরও এক ঘন্টা পরে। এত দেরি করলে চলবে না। তাই স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য অটোওয়ালার একজনের চিৎকারে "এটা আগে যাবে বাবু" বলাতে অনির্বান সেই অটোতে চেপে বসতেই দেখে ট্রেনের ভদ্রমহিলা সেই অটোতে বসে আছেন।

"আরে আপনি!" অনির্বান বলে উঠল। সেই তরুণী হেসে বললেন, "আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল, এবার তো আলাপ করতেই হয়। আপনি?"

"আমি অনির্বান চ্যাটার্জী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ভাগলপুরে একটা কাজে এসেছি। আপাতত মাসির বাড়ি উঠবো, তারপর কাজ বুঝে ব্যবস্থা। আর আপনার পরিচয়?"

অনির্বানের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তরুণী জানালো আমার নাম, মান্যয়ী সেনগুপ্ত, জার্নালিস্ট, বুদ্ধিজীবী বলতে পারেন। বিশেষ কাজে এখানে কয়েকদিনের জন্য আসা। আমিও কলকাতায় থাকি।" কিছুক্ষন বাক্যালাপ করার পর শহরের মূল কেন্দ্রে একটি গেস্ট হাউসের কাছে গাড়ি থামতেই তরুণী অটো থেকে নেমে বাই বলে গেস্ট হাউসের দিকে যাত্রা শুরু করল, আর অনির্বানকে নিয়ে অটো অন্য একটি রাস্তা ঘুরে মাসির বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। অনির্বান পিঠে ব্যাগটা নিয়ে মাসির বাড়ির রাস্তা ধরল।

বাস্তবিক

মাসির বাড়ি পৌঁছতেই মাসি-মেসো যারপরনাই খুশি হল। মাসি বললো, "কতদিন পর এলি বাবা, এবারে আর কোন কথা শুনবো না, বেশ কিছুদিন এখানে থাকতে হবে কিন্তু।"

"সে হবেখণ, মাসি বড্ড খিদে পেয়েছে, আর সারারাত ট্রেনে ঘুম হয়নি। চটপট স্নান সেরে আসছি, তুমি খাবারের ব্যবস্থা করো।"

"সে আর বলতে, তুই স্নান সেরে আয়, আমি খাবার রেডি করছি।" পরম উপাদেয় গরম গরম খাবার খেয়ে ও মাসির স্পেশাল মেড পায়েস ফিরনি ও সুজির গুলাব জামুন খেয়ে অনির্বানের মন-প্রাণ ভরে গেল। এবার বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে একটা লম্বা ঘুম। ঘরে এসে অনির্বান কিছু প্রয়োজনীয় টেলিফোন সেরে নিল। কালকে প্রশাসনের সঙ্গে মিটিং আছে। অ্যাকশন প্ল্যান কি হবে, কিভাবে কাজটা শুরু হবে, কোনো সমস্যা হলে তার মোকাবিলা কি করে হবে, কন্ট্রাক্টরের কত লোক একসঙ্গে কাজ করবে, মাটি কাটার যন্ত্রপাতি কত আসবে, পুলিশি ব্যবস্থা কি থাকবে, এইসব আর কি। মাসি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "পান-সুপারি কিছু খাবি?"

"জোয়ান থাকলে একটু দিতে পার মাসি।" গভীর দিবানিদ্রার পর অনির্বানের ঘুম যখন ভাঙলো তখন সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চা খেয়ে মাসিকে

বলে, অনির্বান একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল। পথেই শিবু খুড়োর সঙ্গে দেখা হতেই খুড়ো একগাল হেসে বলল, "কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম, তা ভালো আছো বাবা।" কুশল বিনিময়ের পর শিবু খুড়ো ধরা গলায় বলল, "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।"

"কি কথা বলুন।"

"না, মানে তুমি তো মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার। তোমার কত নাম ডাক, কত লোকের সঙ্গে তোমার জানাশোনা, তা বাবু আমার ছেলেটা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ঘরে বসে আছে, কোন চাকরি-বাকরি জোটাতে পারছে না। কত পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু কিছুতেই চাকরি হচ্ছে না। তা বাবা, তুমি একটু ওর একটা যাইহোক-তাইহোক কাজ জোগাড় করে দাও না বাবা। লেবারের কাজও ছেলে করতে রাজি আছে। দেখো না বাবা, একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারো কিনা।"

অনির্বান ভাবলো, "কি অবস্থা, গ্রাজুয়েশন করেও কোন কাজ নেই, মুটে-মজদুরের কাজ করতেও রাজি। অনির্বান বললো, "আমি খুব চেষ্টা করব।" তাই করো বাবা, এই বলে শিবু খুড়ো চলে গেল। বেড়াতে বেড়াতে কখন যে অনির্বান বাজার এলাকায় চলে এসেছে বুঝতে পারেনি। একটি মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনতে গিয়ে আবার মান্যয়ী সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। "আরে আপনি, দেখুন বার বার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাচ্ছে,

নিশ্চয়ই এটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত।"

মান্যয়ী সেনগুপ্তর কথার কোন ইঙ্গিত অনির্বান ঠিক বুঝতে পারলো না। শুধু হেসে বলল, "হ্যাঁ ঠিক তাই।"

অনির্বান ভাবল, মেয়েটির মধ্যে কিছু একটা আছে যা অন্যকে আকর্ষিত করে, সেটা শুধু তার রূপ নয়, আরও অন্য কিছু বটে।

মান্যয়ী বলল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা না বলে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে একটু গল্প করা যাক।" চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মান্যয়ী বলল, "আপনি কলকাতায় থাকেন কোথায়?"

"করুণাময়ী সল্টলেকে..."

"আপনি কি বিবাহিত? হঠাৎ এইরকম একটা প্রশ্নে অনির্বান স্বভাবতই বিব্রত বোধ করল।"

"না, এখনো ওটা করে ওঠার সময় পাইনি।"

"বাবা, এত ব্যস্ত যে বিয়ে করার সময় পাননি," এই বলে মান্যয়ী হো হো করে হেসে উঠলো, আর তার ঝকঝকে দাঁতগুলি সুশোভিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অনির্বান বলল, "তা আপনি থাকেন কোথায়?"

জেমস লং সরণি।

আপনি ঠিক কি করেন বলছিলেন যেন?

মান্যয়ী বললো, আমি তো "জার্নালিস্ট ও বুদ্ধিজীবীও বটে। প্রকৃত অর্থে আমি পরিবেশবিদ বলতে পারেন। গবীর

মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায় কিছু হলে রুখে দাঁড়ানোই আমার কাজ। আমি কয়েকটি N.G.O. প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।"

অনির্বান চা খেতে খেতে বলল, "ও তাই। চলুন উঠুন, সন্ধ্যা অনেকক্ষন হয়ে গেছে, এবার আমাকে ফিরতে হবে।"

"হ্যাঁ আপনি উঠুন, কয়েকজন এই চায়ের দোকানেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তাদের এখানে দেখা করতে বলেছি, কথা বলে তারপর উঠব।"

অনির্বানের তরুণীটিকে খুব একটা সুবিধার বলে মনে হলো না। কারোর সম্বন্ধে এরকম ভাবা যদিও উচিত নয়, তবুও ভদ্রমহিলাকে খুব চতুর বলে মনে হচ্ছে। যাকগে, আমার কি দরকার। নিজের কাজ করতে এসেছি, কাজ হয়ে গেলে চলে যাবো। পথের আলাপ পথেই শেষ হয়ে যাবে। অনির্বান বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

কিউল নদীর উপর যেখানটায় নতুন রেলসেতু ও ইলেকট্রিক ইন্টার লকিং হবে সেখানে কন্ট্রাক্টরের লোকজন, মাটি কাটার মেশিন, পুলিশ সবাই এসে গেছে। অনির্বান নকশা খুলে কতখানি ব্যাসার্ধ জুড়ে মাটি কাটা হবে সেটা কন্ট্রাক্টরকে ফিতে ফেলে নির্ধারণ করে দিল। মাটি কাটার মেশিন মাটি তুলতে লাগল আর একদিকে শক্তিশালী পাম্প জল বার করতে লাগল। কয়েক একর জায়গা জুড়ে এই প্রোজেক্ট। কিছু লোক নদীর পাশে গাছগুলোকে কাটতে আরম্ভ করল।

বাস্তবিক

ঘন্টাখানেক পর কয়েকশত গ্রামবাসী সেখানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিল। নদীতে সেতু নির্মাণ করা যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, নদীর পাড় ধ্বসে যাবে, পরিবেশ দূষণ করা চলবে না। তাদের হাতে ব্যানার, পতাকা ও ফেস্টুন ছিল। কিন্তু পুলিশ কর্ডন করে থাকাতে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরও লোকজন জড়ো হতে লাগল। চিৎকার চেঁচামেচি, স্লোগান বাড়তে লাগল।

অনির্বান কলকাতায় ফোন লাগাল। অতীতে এইরকম অনেক সমস্যায় তারা পড়েছে, প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু রফাসূত্র বেরিয়ে এসেছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়ে অনির্বান একটু এগিয়ে গিয়ে সেই গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলল, "আপনাদের মধ্যে কেউ একজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

একটা মোড়ল টাইপের লোক এসে বলল, "এখানে নদীর উপর আমরা কোন ব্রিজ করতে দেব না।"

অনির্বান বলল, "এতে তো যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হবে, সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে ভালোই হবে।"

"না হবে না, নদীর উপর ব্রিজ করলে গ্রামবাসীদের মোটেই ভালো হবে না। অনেকের রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। এই নদী থেকে বহু জেলে পরিবার মাছ ধরে, ব্রিজ হলে মাছ মারা যাবে বা অন্য জায়গায় চলে যাবে। অনেকে ডিঙি নৌকা করে নদী পারাপার করে। রেল চালু হলে

তাদের রোজগার বন্ধ হবে। এছাড়া নদীর পাড় ক্রমশঃ ভাঙতে থাকবে, নদীর পাশে কয়েক একর জায়গায় যে গাছপালা আছে সেগুলি কাটলে পরিবেশ দূষণ হবে।”

অনির্বান গ্রামবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। তারা শাঁসাল, “এই কাজ আমরা কিছুতেই করতে দেব না, তাতে যদি রক্তক্ষয় হয় হোক।” পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে জায়গাটা ফাঁকা করে দিল। কিন্তু একটু দূরে গিয়ে তারা আবার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

কয়েকজন গ্রামবাসী চিৎকার করে বলল, “কালকে আমাদের নেতা আসবে। কাল থেকে বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করবে।” সারাদিন চিৎকার চেঁচামেচি করে কাজের কাজ কিছু হল না। সেদিনের মত কাজ বন্ধ হল। অনির্বান ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলে সন্ধ্যাবেলা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করল। প্রশাসন আশ্বস্ত করল যে কোনরকম প্রব্লেম হবে না। আপনারা সন্ধ্যাবেলায় আসুন, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ক্রমশ... ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

হ্রস্বতর পথ

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

"আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা, তার পরেই আবার পকেট আমার ফুলে ফেঁপে উঠবে। উফফ্, এবারে ছিপ দিয়ে একবারে রাঘব বোয়াল ধরেছি। আজ ভাগ্যের জোরে একটা পোড়া ছেলের বডি পেলাম। তাই বেশি কসরত ছাড়াই মূল্যবান বডি পার্টস উপড়ে নিতে পারলাম। হা হা... আজও মনে পড়ে স্কুলের স্যার বলত সৎ হলে নাকি উন্নতি। যত সব বুজরুকি ভাষণ। ওনার আদর্শে চললে আমি কি আর এমন জাঁদরেল ডাক্তার হতে পারতাম?" সাবর্ণ হাতের গ্লাভসটা খুলতে খুলতে এইসব সাতপাঁচ ভাবতে লাগল।

পিছন থেকে মিস্টার অমিয় মিত্র এসে চারিদিকটা একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে সাবর্ণর পকেটে একটা আশি লাখ টাকার চেক দিয়ে কানের কাছে এসে বলল, "ওয়েল ডান! নেক্সট মাসের জন্য আরো কিছু রেডি রেখো।"

পরিণতি

সাবর্ণ পকেট থেকে চেকটা বের করে দেখতে থাকল, তার চোখটা ক্ষুধার্ত কুকুরের মত লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল। এরপর চেম্বার থেকে বেরিয়ে সে দেখে তার স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সাবর্নকে দেখে, সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ওগো তুমি এইখানে, আগে জানলে এভাবে সবটা শেষ হয়ে যেত না। তোমাকে ফোনে না পেয়ে আমি বাড়ির সামনের এই নার্সিং হোমেই ছেলেকে নিয়ে আসি। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলে গ্যাসের আগুনে পুড়ে যায়। এখন এরা বলছে আমাদের ছেলে আর নেই..."

সাবর্ণর হাত থেকে ভারী চেক্-টা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়... ■

'গুঞ্জন'-এর ২০২২-এর আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

মে – শ্রমিক দিবস সংখ্যা (কাজ চলছে)

জুন – বর্ষা বরণ সংখ্যা

জুলাই – রহস্য, রোমাঞ্চ, কল্পকাহিনী সংখ্যা

*বিশেষ কারণে এই সুচী পরে পরিবর্তিত হতে পারে...

**আমাদের দপ্তরে অনেক লেখা আসে, তাই সব লেখার জন্য প্রাপ্তিস্বীকার করা সম্ভব হয় না। তবে নির্বাচিত লেখাগুলি তিন মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।